ঃ এই সংখ্যায় ঃ
১) কার্বন নিয়ে কারসাজি
২) অশ্বত্থ গাছ, ৩) এলাচি
৪) অলৌকিক চিকিৎসা। ৫) সাপ। ৬) যাত্রী পায়রা। ৭) মাছ চাষে মশা নিয়ন্ত্রন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর)
পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫
জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৮ সংখ্যা - ৪ জুলাই-আগষ্ট / ২০১১ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২

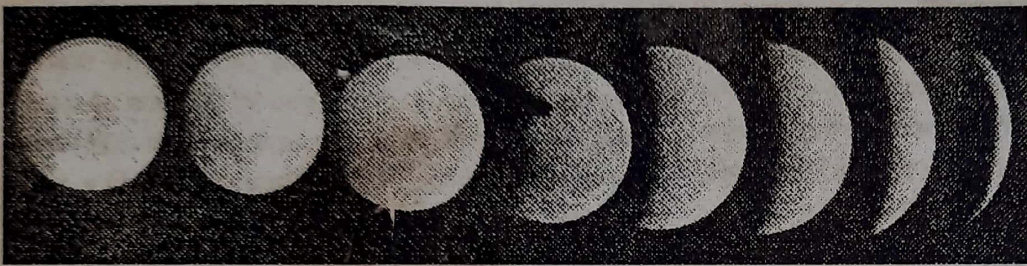

১৬ জুন, ২০১১ বুধবার রাত ১১টা ৫২ মি. থেকে ২টা ৩২ মি. পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের বিভিন্ন দৃশ্য।

জলাভূমি-প্রকৃতির বৃক্ক

পরিবেশ আজ বিপন্ন এ বিষয়ে সন্দেহের অবশ্য কোন অবকাশ নেই। আনুমানিক ২৭০ কোটি বছর পেরিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার। আর তারপর বিবর্তন ও অভিব্যক্তির হাত ধরে এসেছে বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণু, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। শুধু তাই নয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় কৃত্রিম ভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণুও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে আজকের দিনে। অথচ আমাদের ভোগবাদী মানসিকতার একমুখী পরিবর্তনও সমতালে ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। আমাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলেই বিশ্ব পরিবেশে ক্রমশঃ উথালপাতাল অব্যাহত, চলছে ধ্বংসাত্মক সব পরিবর্তন আর তাতে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশের যেসব প্রাকৃতিক ভান্ডার ফুরিয়ে আসছে বা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে 'জলাভূমি' (Wetland) অন্যতম।

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে জলাভূমি মানব সমেত যে কোন জীবের জীবনে এক বিশেষ

এরপর 2 পাতায়

প্রসঙ্গ : জল

"নদী থেকে বা মাটির নীচ থেকে অনুমতি ব্যতিরেকে জল তুললে বা জলের অপচয় করলে শাস্তি পেতে হবে, দিতে হবে জরিমানাও। রাজ্যে মাটির নীচ থেকে জল তোলা সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা লাগু রয়েছে, তবে বলা ভাল তা রয়েছে খাতায়-কলমে। মাটির নীচের জলস্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তাই সে আইন কার্যকর করা জরুরি। এর নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ থাকবে এটাই কাম্য।" (সম্পাদকীয় উঃ বঃ সংবাদ, ২৩/৪/২০১১)।

২২/১২/২০১০ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভূগর্ভের জলসঙ্কট মানল রাজ্য, রুখতে ব্যবস্থা' শীর্ষক একটি সংবাদ ছিল। শুরু হয়েছে এভাবে, "অবশেষে টনক নড়ল রাজ্য সরকারের। নির্বিচারে জল তুলে নেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভের জলস্তরের অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটজনক, বিধানসভায় দাঁড়িয়েই তা স্বীকার করে নিল তারা।"

রাজ্য সরকারের টনক নড়ল কি? মোটেই না। তাহলে তো

এরপর 4 পাতায়

পুকুর ঘিরে সমস্যা

বাঁধানো পুকুর একটা মৃত চৌবাচ্চা ছাড়া কিছুই নয়

বর্তমানে খাল, বিল, পুকুরের মত ছোট-বড় জলাশয়গুলি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা খুব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শহর ও শহরতলি এলাকাগুলোতে বেশি হচ্ছে। পুকুরের চারিধারের মাটি ঝুর ঝুর করে খসে পড়ে পাড় ভেঙে দেয়। ফলে পাড় সরে গিয়ে জলাশয়ের আয়তন বাড়তে থাকে। পাড়ের রাস্তা ভেঙে চলাফেরার বাধা সৃষ্টি করে। এই যুক্তিতে পুকুরের মালিকেরা পুকুর রক্ষণাবেক্ষণের নামে সিমেন্ট দিয়ে পাড়টা বাঁধিয়ে দেন বা দিচ্ছেন। এর ফলে পাড় আর ভাঙবে না; আর দেখতেও ভাল লাগবে। পুকুরের সীমানা নির্দিষ্ট

এরপর 5 পাতায়

জলাভূমি-প্রকৃতি....

1 পাতার পর

ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিবেশবিদ্‌দের ভাষায় জলাভূমি হল ‘প্রকৃতির বৃক্ক বা কিডনি (Nature's Kidney)’। কিডনি বা বৃক্ক যেমন আমাদের দেহের বিপাকজাত বর্জ্যপদার্থ পরিস্কার করে তেমনি জলাভূমি প্রকৃতির বর্জ্য শোধনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশকে দূষণ মুক্ত হতে সাহায্য করে।

জলাভূমি কি?

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে জলাভূমির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া হল— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিদ্‌দের মতে যেসব অঞ্চল বছরের অন্তত কিছু সময় ২.৫ সেমি থেকে ৩০০ সেমি পর্যন্ত জল ধরে রাখে তাকেই ‘জলাভূমি’ বলা যায়।

এশিয়ান ওয়েট ল্যান্ড ব্যুরোর (Asian Wetland Burèau) মতে, জলাভূমি বলতে বোঝায় খাঁড়ি, ব-দ্বীপ, মিষ্ট ও লবনাক্ত জলাজায়গা, ম্যানগ্রোভ্ অঞ্চল, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, বাদাবন, নদীনালা, মানুষের তৈরি ধানের ক্ষেত যেখানে জল জমে, মাছের পুকুর প্রভৃতি।

১৯৭১ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ‘রামসার’ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—‘জলাভূমি হল ভূপৃষ্ঠের উপরে স্বাভাবিক বা মানুষের তৈরি অগভীর জলে ডোবা এলাকা, ছোট-বড়ো মাপের পুকুর, বিল, হ্রদ এবং অন্যান্য জলাশয় যার জল লবনাক্ত, কষা বা মিষ্টি হতে পারে এবং যা ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন জায়গায় হতে পারে যেমন নদীর অববাহিকায় সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়ের ঢালে, মরুভূমির মধ্যে ইত্যাদি’।

এক সময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলাভূমিগুলোকে বোজানো হয়েছে কিংবা নষ্ট করা হয়েছে। চল্লিশের দশকে পরিবেশবিদদের মধ্যে প্রথম জলাভূমির গুরুত্ব বিষয়ক ধ্যান ধারণার অবতারণা। এরপর IUCN (International Union for Consetvation of Nature and Natural Resources নামক পরিবেশ প্রেমী সংস্থার উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে সারা বিশ্বজুড়ে জলাভূমির উপর একটি গবেষণা চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বহুদেশ জলাভূমি সংরক্ষণের উপর একটি সাধারণ নীতি তৈরি করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার নামক শহরে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। যেখানে বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা জলাভূমি সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং তার বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার এর জন্য একটি চুক্তিতে সই করেন যাকে 'Contracting Party' বলা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো উক্ত দেশগুলো মেনে চলবে বলে স্থির হয়। এই বৈঠকের সূত্র ধরেই একটি রামসার ব্যুরো (Ramsar Bureau) তৈরি করা হয় সুইজারল্যান্ডের গ্লান্ড শহরে। একটি হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে মোট ২১৬৭টি প্রাকৃতিক জলাভূমি যার মোট আয়তন ১৪,৫০,৮৬১ বর্গ হেক্টর এবং ৬৫,২৫৩টি মনুষ্যসৃষ্ট জলাভূমি যার মোট আয়তন ২৫,৮৯,২৬৬ বর্গ হেক্টর। অবশ্য বিশেষভাবে চিহ্নিত সারা পৃথিবীতে ‘রামসার জলাভূমি’র সংখ্যা ১১৭৯টি যা বিশ্বের অন্তত ১৩৩টি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যার মোট আয়তন ১০,২১,২৬,৭৬০ হেক্টর। পৃথিবীর প্রথম বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ‘রামসার জলাভূমি’ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ‘কোবুর্গ পেনিনসুলা’। আবার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিষ্টমাস আইল্যান্ডে অবস্থিত হস্‌নিস্ স্প্রীং পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ‘রামসার জলাভূমি’ যার আয়তন মাত্রা ০.৩৩ হেক্টর এবং বৎসোয়ানার ওকনাভাঙ্গো ডেল্টা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রামসার জলাভূমি যার আয়তন ৬,৮৬৪,০০০ হেক্টর সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার স্বাদু জলের জলাভূমি কে সর্ববৃহৎ জলাভূমি হিসেবে ধরা হচ্ছে।

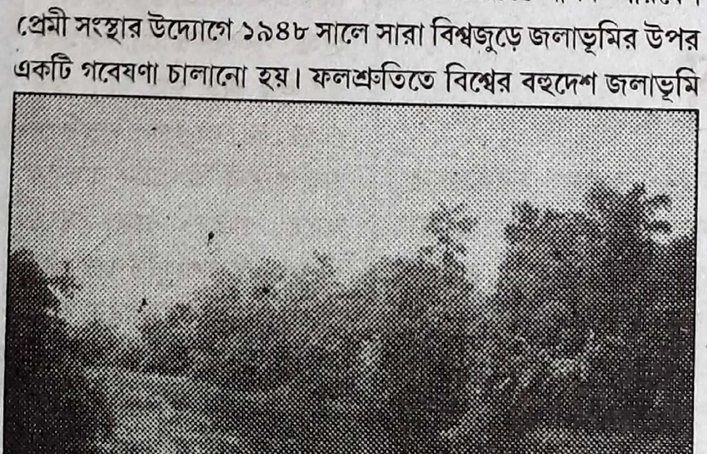

কোচবিহার রসমতি অরণ্যের জলাশয় ছবি ঃ জয়দেব দে

আমাদের দেশে ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম জলাভূমি সংরক্ষণ আইন, তৈরি করে। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে এই আইন পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়। ভারতের বিভিন্ন জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভারত সরকারের অধীনস্থ এই কমিটি ১৬টি জলাভূমিকে রাম সার চিহ্নিত করে সংরক্ষণ কার্যক্রম নেওয়ার সুপারিশ করেছেন যার মধ্যে ওড়িষার ‘চিল্কা’, অন্ধ্রপ্রদেশের ‘কলেরু’, চন্ডীগড়ের ‘সুখনা’, রাজস্থানের নিচোলা ফতেহসাগর, পাঞ্জাবের ‘কাঞ্জলি ও হারিক’, জম্মু ও কাশ্মীরের ‘উলার’, মনিপুরের লোকটাক, হিমাচলপ্রদেশের রেনুকা, মধ্যপ্রদেশের ‘ভোজ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ৫৪টি প্রাকৃতিক এবং ৯টি মনুষ্যসৃষ্ট জলাভূমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর ইংরাজি ১৬ই জুন বা বাংলা ১লা আষাঢ় কে জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস পালন করে আসছে। মূলত রাজ্য মৎস্য দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারী ভাবে এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। তবে, সারা বিশ্বে ২রা ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস পালন করা হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব কলকাতার জলাভূমি (আয়তন ১২,৫০০ হেক্টর) কে রামসার জলাভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সুন্দরবন এলাকার ২ লক্ষ হেক্টর বিস্তৃত জলাভূমিকে সংরক্ষণের জন্য যৌথভাবে বনদপ্তরের সাথে কাজ করছে।

এরপর 3 পাতায়

জলাভূমি-প্রকৃতি....

2 পাতার পর

সারা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জলাভূমি সংরক্ষণ করা দরকার। ১৯৯৫ সালে রাজ্যে বনবিভাগ পুর্নগঠনের সময় জলাভূমি সংরক্ষণ ও জৈববৈচিত্র্যে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে 'Institute of Wetland Managerment' প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ভাবে রাজ্যের আটটি জলাভূমি সংস্কার করার সুপারিশ করে যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার বরাতি বিল, হুগলী জেলার 'কাজলা দিঘি', বর্ধমান জেলার 'চুপিচর (পূর্বস্থলী)', মুর্শিদাবাদের 'কাটিগঙ্গা' ও 'মতিঝিল', দক্ষিণ দিনাজপুরের 'মালিয়ান দিঘি' ও 'আলতাদিঘি' এবং কোচবিহারের 'রসিক বিল' উল্লেখযোগ্য।

জলাভূমির গুরুত্ব

১) জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঃ- জলাভুমিতে এক বিশেষ ধরনের জটিল বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়। বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে বসবাস করে। শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া ও অন্যান্য বহু অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী পাখি এখানে আসে। খাদ্য, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। জলাভূমি নষ্ট হলে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচবে না ফলে বাস্তুরীতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে যার পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ফল আমরা ভোগ করবো।

২) ভৌমজলের পরিমাণ বজায় রাখা ঃ- জলাভূমির জল চুঁইয়ে মাটির নীচে ধীরে ধীরে জমতে থাকে যা ভৌমজলের ভান্ডার রূপে কাজ করে। আর এই ভৌমজলই আমরা গভীর ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে ব্যবহার করি। যেভাবে আমাদের দোষেই পানীয় জলের স্তর ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে তাতে আগামী দিনে জলের তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে। সেদিক থেকে দেখলে জলাভূমি সংরক্ষণের উপরও সঞ্চিত ভৌমজলের পরিমাণ নির্ভর করছে। জলাভূমি সংরক্ষণ করতে না পারলে ভৌম জলের পরিমাণ কমে যাবে আর তাতে জলের সরবরাহ কমে আসবে।

৩) জলের গুণগত মান বজায় রাখা ঃ- জলাভূমিতে যে সমস্ত জলজ উদ্ভিদ বিশেষ করে শ্যাওলা জন্মায় তারা জলাভূমির জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থকে শোষণ করে নেয়। যাদের উপস্থিতি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে জলাভূমির জলের গুণগতমান বজায় থাকে।

৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলমগ্নতারোধ ঃ-ভারী বর্ষণের পর অতিরিক্ত জল ধারণ করে সাময়িক ভাবে বন্যা রোধ করতে পারে এই জলাভূমি। এছাড়া দ্রুত জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে রাস্তাঘাটকে জলমগ্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে জলাভূমি সাহায্য করে।

৫) সামুদ্রিক ঝড় এবং উপকূল অঞ্চলে ক্ষয়রোধ ঃ- সমুদ্রের নিকটবর্তী জলাভূমি সামুদ্রিক ঝড় বা তুফানের তীব্রতা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এছাড়া সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জলাভূমিতে ভেঙে পড়ে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে জমির ভাঙ্গন রোধ করে।

৬) জলাভূমি জল সঞ্চয় করে একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদিকে মাটির আদ্রর্তা বজায় রেখে ক্ষরাও নিয়ন্ত্রণ করে।

৭) দূষণ রোধে ঃ- জলাভূমি দূষণ রোধে এবং পয়ঃপ্রনালীর দূষিত বর্জ্য জল পরিশোধনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৮) মশা নিয়ন্ত্রণে ঃ- মশা দমনেও জলাভূমির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জলাভূমির কয়েকটি মাছ মশার লার্ভা ভক্ষণ করে। এতে মশার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৯) অগ্নিনির্বাপন ঃ- জলাভূমি কাছাকাছি থাকলে সহজেই দুর্ঘটনাজনিত কোন অগ্নিকান্ড রোধ করা যায়। সম্প্রতি কলকাতার বড় বাজার এলাকায় জলাভূমির অভাবের জন্য ঐ এলাকাটি অগ্নিকান্ডে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১০) অর্থনৈতিক উপকরণ হিসেবে ঃ- ক) জলের ভান্ডার হিসেবে স্থানীয় ভাবে জলাভূমি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ) নানান ধরনের বাণিজ্যিক ফসলের চাষ হয় জলাভূমিতে-যেমন পাট, ধান, পানিফল প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভেষজ মূল্যবান উদ্ভিদ জন্মায় এখানে।

গ) জলাভূমিতে মাছ এবং চিংড়ির চাষ ভালো হয়।

ঘ) পলি ধরে রাখা এবং নতুন জমি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জলাভূমির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ঙ) জলাভূমির জল, সেচের কাজে এবং পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চ) জলপথ পরিবহনে ও শক্তি উৎপাদনেও জলাভূমি ব্যহার করা যায়।

সর্বপরি খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তিস্থাপনে জলচক্রের কার্যকারিতা রক্ষায়, মানব সম্পদ উন্নয়নে জলাভূমির জুড়ি মেলা ভার।

জলাভূমি সংরক্ষণের আমাদের ভূমিকা কি ?

সত্যি কথা বলতে এই জলাভূমি বাঁচাতে আমাকে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে স্থানীয় ভাবে। গুরুত্ব সম্পর্কে লোককে সচেতন করতে হবে, বোঝাতে হবে সাধারণ মানুষকে। প্রয়োজনে প্রতিবাদের রাস্তায় কিংবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা পঞ্চায়েত মারফৎ সমবেতভাবে একাজে এগিয়ে আসতে হবে। একটি যেকোন অঞ্চলের জলাভূমি আসলে ঐ অঞ্চলের একটি বিশেষ জৈব বৈচিত্র্যের আধার—এই বার্তাটি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

বর্তমান সংকটগ্রস্ত জলাভূমি ঃ- জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম অথচ জলাভূমি ধ্বংসের ব্যাপকতা গত কয়েক দশক জুড়ে সারা পৃথিবীতেই চলছে। নতুন নতুন নগরায়ণ, কলকারখানা, চাষবাস ও বসতির চাহিদা মেটাতে, কৃষি বর্জ্যের দূষণ, আগাছা বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য জলাভূমি ধ্বংসের মুখে। আমাদের রাজ্যের খোদ রাজধানীর উপকণ্ঠে সল্টলেক বা লবনহ্রদ নামক বিশাল জলাভূমি বুজিয়ে প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি অফিস-কাছারি, বাড়ি,ঘর ও বিনোদন পার্ক গঠন করা হয়েছে। অথচ

এরপর ৪ পাতায়

প্রসঙ্গ : জল

1 পাতার পর

একের পর এক পাথর খাদান, ফেরো অ্যালয় ও স্পঞ্জ আয়রন কারখানার যথেচ্ছাচারে রাশ টানা হত। এরা যথেচ্ছভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলছে, কারখানার বর্জ্য দিয়ে বুজিয়ে ফেলছে একের পর এক জলাশয়। রাজ্য সরকারের ভ্রুক্ষেপ আছে বলে তো মনে হয় না।

সুরমানগর গ্রামের সুরমা দিঘি—১৪০ বিঘারও বেশি জায়গা জুড়ে (বিষ্ণুপুরে, রামসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা) অবস্থিত। এখন মাত্র কয়েক কাঠা জায়গাতে জলাশয় বিরাজ করছে। ২০০২ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে গড়ে উঠেছে চারটি ফেরো অ্যালয় কারখানা। ডব্লিউ বি আই আই ডি সি গ্রোথ সেন্টারের এলাকাতে কারখানাগুলি থেকে স্ল্যাগ (ধাতুমল) এনে সুরমা দিঘির পাড় বরাবর ফেলা হতে থাকে। আর ক্রমশ চারপাশের জমি অধিগ্রহণ করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। কারখানাগুলোতে সিলিকো ম্যাঙ্গানিজ, ফেরো ম্যাঙ্গানিজের পাশাপাশি বহুল পরিমাণে তৈরি হচ্ছে ফেরোক্রোম। ফেরোক্রোমের বর্জ্যে ক্রোমিয়ামের মত অম্ল ধাতু ভাল পরিমাণে থাকে যা মাটি ও জলদূষণের ভয়াবহ কারণ। এই ফেরোক্রোমের বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলার নিয়ম নেই। কয়েক কিলোমিটার দূরেই দামোদর। দারকেশ্বর ও বিঁড়াই নদী কাছাকাছি হলেও সেখানে ক্রমাগত ভূগর্ভের জল তুলে কাজ চালান হচ্ছে .. চাষবাস শিকেয়। ক্ষেতের পর ক্ষেত জুড়ে শুকনো হলদেটে ঘাস। বিস্তীর্ণ জমি এভাবে নষ্ট হবে, বিঘের পর বিঘে ডাঁই হতে থাকবে দূষিত স্ল্যাগ। উর্বর জমি সকল পাথুরে ফাটলে পরিণত হলে পতিত জমির অজুহাতে চলতে থাকবে কারখানা সম্প্রসারণ। বাঁকুড়ার মত খরাপ্রবণ এলাকায় সুচিন্তিতভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা জরুরী, রাজ্য সরকার মোটে ১২টি স্কুলে রেন ওয়াটার হারভেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করে ভূগর্ভস্থ জলের অপচয় দেখেও হাত গুটিয়ে রয়েছে। একটি মোটামুটি ১০০ টন ফেরো অ্যালয় উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিটে ই এস পি চালানোর গ্যাস কন্ডিশনিং টাওয়ারকে সক্রিয় রাখতে ঘন্টায় দশ হাজার লিটার জল আবশ্যক। পূর্বোক্ত কারখানাগুলিতে সেই জলের পুরোটাই তোলা হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে। আরও স্পঞ্জ আয়রন কারখানা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে পুরুলিয়াতেও।

পুরুলিয়ায় বিগত দশ বছরে যে ৩২টি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে তার ২৯টিই স্পঞ্জ আয়রন কারখানা। এক টন স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনের জন্য জল লাগে ১.৫০ থেকে ২ টন। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাথরখাদানগুলি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভূগর্ভের জলস্তর। যথেচ্ছভাবে সেখানে মাটির তলা থেকে জল পাম্প করে তুলে ফেলে চলছে মাইনিংয়ের কাজ। মহম্মদবাজারে (বীরভূম) পাথরখাদানের উৎপাতে বিগত দশ বছরে ভূগর্ভের জলস্তর ১৫ ফুটেরও বেশি নেমে গেছে। শুকিয়ে যাচ্ছে কুয়ো। বাসিন্দারা আন্দোলন করে প্রায় দশ মাস খাদানের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। আনন্দের ব্যাপার, ধীরে ধীরে শুকনো কুয়োগুলো আবার জলে ভরে উঠেছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ভারত সবচেয়ে বেশি ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে থাকে—গোটা পৃথিবীতে ভূগর্ভের জলের ব্যবহারের এক চতুর্থাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল অপচয়ের কারণে আর্সেনিকের মাত্রা ভয়াবহ। ভাগীরথী-হুগলী নদীর উপত্যকায় প্রধানত ৮টি জেলার ৩৭৪৯৩ বর্গকিমি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের প্রকোপ মাত্রাতিরিক্ত।

বীরভূমের নসীপুর গ্রাম, জনসংখ্যা ২০০০। কিছুকাল আগে ফ্লুরোসিসের প্রকোপে সেখানে ৩০০ জন গ্রামবাসী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রামবাসীদের হিসেবে অসুস্থের সংখ্যা বেড়ে ১২০০ দাঁড়িয়েছিল। অনুসন্ধানের ফসল — নসীপুরের জলে ফ্লোরাইডের পরিমাণ ১৪ পি পি এম, সেখানে ১.৫০ পি পি এম পর্যন্ত মাত্রাকে স্বাভাবিক ধরা যেতে পারে।

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া পথ কোথায়?

(লেখ সূত্র - উঃ বঃ সংবাদ ঃ ২৩/৪/১১, আ বা পত্রিকা ঃ ২২/১২/২০১০, আজকের পঞ্চায়েত বার্তা : ১/৩/২০১১)

তপন চন্দ, ৯৭৩৩১৫৩৬৬, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি।

জলাভূমি-প্রকৃতির বৃক্ক

3 পাতার পর

এই লবনহ্রদকে 'কলকাতার ফুসফুস' বলা হত। খুব সামান্য অংশই এখনও বেঁচে রয়েছে।

'জলাভূমি' নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই সাধারণ মানুষ কিংবা প্রশাসনের। এ বিষয়ে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও একটার পর একটা জলাভূমি বুজিয়ে শহর এলাকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। এই আইনে দোষী ব্যক্তি জেল ও জরিমানা দুটিরই সংস্থা রয়েছে অথচ দুঃখের বিষয় আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দেশেরই বড় বড় শহর বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর জলাভূমি বুজিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরি করা এবং মোবাইল টাওয়ার বসানো হচ্ছে।

এই জলাভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রশাসনকে আরও বেশি দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। প্রত্যেকের বাসযোগ্য, নির্মল, সুস্থির পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদেরকেও আরও অনেক বেশি দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। বর্তমানে ন্যূনতম ৫ কাঠা জমির ওপর তৈরি প্রাকৃতিক জলাভূমি কিংবা ন্যূনতম ১৫-২০ বছর পুরোনো কৃত্রিম জলাভূমি বোজানো যায় না। এমনকি ব্যক্তিগত হলেও না। এই বিষয়টিকে মাথায় রাখতে হবে প্রয়োজনে জেলা মৎস্য দপ্তরের পরামর্শ মেনে জলাভূমি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে, জলাভূমির এই মাপকাঠিরও পরিমার্জন হতে পারে। এখনই জলাভূমি নিয়ে ভাবা দরকার অন্যথায় অনেক দেরি হয়ে যাবে।

—লেখক ঃ রাজা রাউত

কৃতজ্ঞা স্বীকার 'জলাভূমি সংরক্ষণের গুরত্ব'—একটি প্রতিবেদন, ডাঃ গৌতম ঘোষ। মোঃ-৯৪৭৪৪১৭১৭৮

পুকুর ঘিরে সমস্যা

1 পাতার পর

হবে; পুকুর বোজানোরও ভয় থাকবে না। সাধারণ মানুষের এতে সায় থাকে। কিন্তু তলে তলে যে সর্বনাশটি হচ্ছে তা পুকুরের মালিক আর সাধারণ লোকেও বুঝছে না। পুকুর সংরক্ষণের নামে এটা হল পরিবেশ ধ্বংসের খেলা। পাড় বাঁধানোর সাথে সাথে যদি ক্ষতির প্রভাবটা বোঝা যেত, তাহলে জনসাধারণ তক্ষুনি রুখে দাঁড়াত। কিন্তু প্রভাবটা পড়ে ধীরলয়ে। মালিকের স্বার্থসিদ্ধিতে তার দিক দিয়ে পাড় বাঁধানো ব্যাপারটা খুবই ক্ষুদ্র ঘটনা কিন্তু পরিবেশের কাছে এর প্রভাব ব্যাপক। সেটা কি রকম? পুকুরের পাড় ভেঙে যাওয়ার কারণ, আজকের দিনে বেশির ভাগ জলাশয়ের চারপাশে জলে নুয়ে পড়া গাছের সারি আর দেখা যায় না। থাকলেও অনিয়মিত ভাবে দু'একটা; যেগুলো না থাকার প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে পুকুরের পাড়ে। বড় বড় গাছ মাটি শক্ত করে ধরে রাখে। পুকুরের পাড়ে গাছপালা থাকলে মাটি ধসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। গাছ কেটে যেমন বায়ু দূষণ ঘটাচ্ছি, তেমন পুকুর পাড়ের মাটি ধসে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়াচ্ছি। জলাশয়ের পাড় জলেরই একটা অংশ। এই পাড়কে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'ইকোটোনিক জোন'। এই পাড় ধীরে ধীরে গিয়ে জলে মেশে। পাড় ও জলের মিলন অংশটি জলাশয়ের অত্যন্ত সজীব অংশ। এইখানে জীব-বৈচিত্র্য বেশি। এখানে দেখা মিলবে ছোট ছোট গাছগাছালি। পাট শ্যাওলা, এজোলা, ছোট পানা, টোপা পানা, হিংচা, নল খাগড়া, মোথা ঘাস ও অন্যান্য গুল্মলতার ভিড় এখানে। এখানে বসবাস করে ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, গেঁড়ি, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কাদা কচ্ছপ, ফড়িং, কেঁচো, বিছা, গয়াল পোকা, খট্টাশ, বেজি ও অনেক অন্যান্য ছোট পোকা-মাকড়। ছোট পোকা-মাকড়, ফড়িং, ঘাস, লতাপাতার উপর ডিম পাড়ে। আবার এই ঘাস, লতাপাতার ভেতর ঘাপটি মেরে খাবারের জন্য বসে থাকে মাছরাঙা, বক, সারস, ডাহুক, গাং চিল, হাঁস, বুনো হাঁস আরো কত পাখি। পাড়ের গর্তে বাসা বাঁধে সাপ, গোসাপ, কচ্ছপ। কই, মাগুর, গুলে মাছ পাড় সংলগ্ন অংশে প্রজনন করে। পাড়ে বেড়ে ওঠা বড় গাছে অনেক ধরনের পাখি বাসা বাঁধে আর সেখান থেকেই খাবার পেয়ে যায়। ছোট গাছপালাতে বাসা বাঁধে মাছরাঙা, ডাহুক, পানকৌরী, সারস, বুনো হাঁস। বড় গাছ লম্বায় বেশি হওয়ায় বেশিরভাগ সূর্যরশ্মিকেই গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু জলের মুখে নিম্নস্তরে যেসব লাইকেন, মস, ঘাস, বিরুৎশ্রেনির অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলো অল্প আলো ও তাপেই খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে। এতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন তৈরি হয়, তাতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে। ঘাস ফড়িং থেকে শুরু করে কিছু কীট পতঙ্গ বেঁচে থাকে এইসব সবুজ শ্যাওলা ও ছোট লতাপাতা খেয়ে। কিছু পাখি আবার মাছ, গেঁড়ি, মাকড়সা, ছোট কাঁকড়া খেয়ে জীবনধারণ করে। ব্যাঙ মশার লার্ভা খেয়ে আমাদের খুব উপকার করে। এতে ম্যালেরিয়া রোগের প্রবণতা কমে। খট্টাশ, বেজি, সাপ, বনবিড়াল খাদ্য হিসেবে পায় পুকুরের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। পাড় ধোয়া জল যখন পুকুরের জলে মেশে তাতেও থাকে খাদ্য হিসাবে জলজ প্রাণীর জন্য কিছু পুষ্টিকর উপাদান। এইসব পুষ্টিকর উপাদানের জন্য ছোট, মাঝারী ধরনের মাছেরা পুকুরের ধারে এসে ঘোরাফেরা করে। ছোট ছোট জৈব পদার্থ সমূহের মৃত্যু ঘটলে জলের অভ্যন্তরের মৃতজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সেগুলোকে বিয়োজন ঘটিয়ে সরলীকৃত করে। এইসব রাসায়নিক অজৈব পদার্থকে ফের জলজ সবুজ গাছপালারা গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই ইকোটোনিক জোন থেকে একটি সুন্দর বাস্তুতন্ত্র (Eco-system) পাচ্ছি। পাড় থেকে যত জলের গভীরের দিকে যাবে, ততই আলো, অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকবে। ফলে গভীরের দিকে ইকোসিস্টেমের এত বৈচিত্র্য থাকে না। তাই জলাশয়ের পাড়েই ইকোসিস্টেমে উল্লিখিত প্রাণী, উদ্ভিদ ও অজৈব উপাদান নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এখন পাড় বাঁধালে পাড়ের সমস্ত জীবকূল ধ্বংস হয়ে যাবে। জন্মাবে না কোনও জলজ গাছপালা। জলজ প্রাণীরা পাবে না তাদের বাঁচার রসদ-খাবার আর অক্সিজেন। কংক্রিটে চাপা পড়ে যাবে ব্যাঙ, সাপ, গোসাপ, কচ্ছপ ইত্যাদির বাসা। এরা সিমেন্টের খাড়া দেওয়াল বেড়ে উঠতে পারবে না; নিচেও নামতে পারবে না। গাছপালা ও খাবার না পেয়ে মাছরাঙা, হাঁস, মেছো বক, পানকৌরী, ডাহুক ইত্যাদি পাখি অসহায়ভাবে চিরতরে হারিয়ে যাবে। আশ্রয় থাকবে না শামুক, গুগলি, ঝিনুক, কেঁচো, বিছা কারোরই। পাড়ের ছোট-বড় গাছের দোলায় জলে যে মৃদুমন্দ ছোট ছোট ঢেউ ওঠে তাতে অক্সিজেন জলে ভালভাবে মিশে যেতে পারে। পুকুর বাঁধালে, গাছপালা না থাকায় হাওয়ার সেই স্নিগ্ধ ঢেউয়ের পরিবেশ পাবো না। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো মানেই জলচর প্রাণী স্থলে আসতে পারবে না, আবার স্থলচর প্রাণীরাও জলের নাগাল পাবে না। অল্প তাপেই জল গরম হয়ে যাবে। এককথায় পুকুরটা তখন বড়সড় চৌবাচ্চা ছাড়া কিছুই নয়। ইঁট কংক্রিটে বাঁধানো পাড়ে আরও অসুবিধা আছে। যেমন বর্ষাকালে রাস্তাঘাটের জল পাড় বেয়ে জলাশয়ের জলে মিশতে পারে না। এই জল রাস্তায় জমে গিয়ে থৈ থৈ করে। এর ফলে পুকুরের জল ধারন ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমে যায়। পাড়ের বাইরে জল জমে গিয়ে মশার আঁতুড় ঘর হয়ে ওঠে। পুকুর পাড়ে যে শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, কেঁচোর মত জল পরিশোধক প্রাণী বসবাস করে, পাড়ে এরা না থাকলে প্রাকৃতিক পরিশোধন বন্ধ হয়ে যায়। অনেক জায়গায় বাঁধানো পাড় বরাবর বৈদ্যুতিক বাতি লাগিয়ে জায়গাটা ঝকঝকে করে তোলা হয়। এতে আরও বেশি ক্ষতি হয়। জলাভূমিতে আলো পড়লে পাখি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বায়োলজিক্যাল ক্লক বিঘ্নিত হয়। তাই পাড় যেমন বাঁধানো যাবে না, জলে আলো ফেলাও যাবে না।

জলাশয় রক্ষণাবেক্ষন করতে হলে জলাশয়ের ঢালে শক্ত কাঠের খুঁটি একটু ছাড়া ছাড়া করে টিনের পাত সহযোগে পুঁতে দিতে হবে। ইঁট পাথরের টুকরো খোলাম কুচি যাতে পুকুরের জলে ঢুকে না যায় তার জন্য তারের জালি ব্যবহার করতে হবে। বাঁশ ও তার জালির ফাঁকটুকু মাটি ফেলে পূরণ করতে হবে এতে খরচা কম। স্বাভাবিক

এরপর 6 পাতায়

অশ্বত্থ গাছ

এর বৈজ্ঞানিক নাম - *Ficus religiosa Linn* সংস্কৃত নাম অশ্বথ। হিন্দী—পিপল, পিপলি। অশ্বথ গাছ সাধারণত জীর্ণ বৃক্ষকোটরে চারাগাছ জন্মগ্রহণ করবার পর প্রথমতঃ শাখা বা পত্রপল্লব বিস্তার না করে শিকড় ও তার শাখা প্রশাখাগুলিতে ক্রমশঃ নীচের দিকে প্রসারিত করতে থাকে এবং দু-এক বছরের মধ্যেই মাটির নাগাল পেয়ে ক্রমশ স্ফীত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই শিকড় বা ঝুরিগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর জড়াজড়ি করে কান্ডের আকার ধারন করে। প্রতি বছরই এদের পাতা ঝরে পড়ে এবং বসন্তের প্রারম্ভে নতুন মুকুল গজায়। পাতাগুলো দেখতে অনেকটা গাছ পানের মতো কিন্তু আকারে অনেকটা ছোট। পাতার মধ্যশিরার দুপাশে উপশিরাগুলি সমান্তরালে বিস্তৃত। বোঁটাগুলি বেশ লম্বা। বোঁটার গোড়ার দিকে জোড়ায় জোড়ায় ক্ষুদ্রাকৃতির ফল ধরে। ভারতের প্রায় সব জায়গায় অযত্নে বর্ধিত বা পথের পাশে রোপিত অশ্বথ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বীজ অথবা কলম থেকে নতুন গাছ উৎপন্ন হয়ে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধরা এই গাছকে পবিত্র বলে মনে করে। খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটলে কোনও কোন অঞ্চলে এদের ফল এবং কচি পাতা খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। পাখিরা প্রচুর পরিমাণে অশ্বথের ফল উদরস্থ করে থাকে। শুষ্ক ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে এতে ৯.৯% জলীয় পদার্থ, ৭.৯% অ্যালুমুনিয়নের ৫.৩% তৈলাক্ত পদার্থ ৩৪.৯% কার্বোহাইড্রেট ৭.৫% রঞ্জক পদার্থ ৮.৩% ছাই ১.৮৫% সিলিকা এবং ০.৬৯% ফসফরাস (P_2O_5) আছে। সাধারণ ঘাস অপেক্ষা এদের পাতায় দুই তিনগুণ বেশি প্রোটিন পাওয়া যায়। শুঁটি জাতীয় পশুখাদ্য অপেক্ষা এদের পাতায় দুই-তিনগুন বেশি চুন জাতীয় পদার্থ আছে। অবশ্য পাতার পুষ্টিকর পদার্থ বেশি থাকলেও অন্যান্য পশুখাদ্য অপেক্ষা সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। এই গাছের কর্তিত স্থান থেকে একরকম খাদ্য রস নির্গত হয়। এতে ০.৭% থেকে ৫.১% রবার জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। বটের আঠার মতো এই রসও মোটর-টায়ারের ছিদ্র বন্ধ করবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অশ্বথ গাছের কাঠ সাধারণত প্যাকিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ছালে প্রায় ৪% ট্যানিন পাওয়া যায় এবং এ বেশ ঝাঁঝালো। এই ছালের চর্মরোগে ও ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হয়। জলের সাহায্যে এই ছাল হতে নিষ্কাশিত পদার্থে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস ও ই. কোলাই ব্যাক্টেরিয়া দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। অশ্বথ গাছের পাতা ও কচি মুকুল চর্মরোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

লেখকঃ শৈবাল কুমার গুহ, ফোন ঃ ২৫৫৬৩৯১০

এলাচি

উপক্রান্তীয় চিরচরিৎ বনাঞ্চলে ৭৫০-২০০০ মিটারের মতো খাড়া পাহাড়ের পায়ে ঝরণার ধারে এলাচির আদি উৎপত্তিস্থান। এলাচির চাষ হয় উষ্ণ ও আর্দ্র ছায়াতন অঞ্চলে। প্রধানতঃ হিমালয়, পশ্চিম ও পূর্বঘাট পর্বতমালা থাইল্যান্ড, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ইত্যাদি অঞ্চলে এলাচির চাষ হয়ে থাকে। এর চাষের জন্য বছরে ২৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত ও ১০°-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। পাহাড়ি অঞ্চলে উর্বরা মাটি ও জৈব সার এর চাষের পথে অনুকূল, সুপার ফসফেট এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে ফলন বেশি হয়। এলাচি দুপ্রকারের - বড়ো এলাচি (*Amomum cardamom*) এবং ছোটো এলাচি (*Elettoaria cardamom*)।

বড়ো এলাচি ঃ পাতা বর্গাকৃতি ও ত্বক পুরু, ফুল বাদামি, আবর্তিত, মোচা-আকৃতি ও মঞ্জরীপত্র দ্বারা আবৃত। ফল মেস্তা-আকৃতি, লাল বাদামি, পুরু ও গাঁমালো খোলার আবরণে অনির্দিষ্ট সংখ্যক কালো বীজ থাকে। ফল রোদ বা মাটির সাহায্যে শুকালে তামাটে রং হয় এই বড়ো এলাচি। সাধারণত পুরানো সবল গাছের গোড়া থেকে সংগৃহীত দু বছরের পুরানো কন্দ ১৫০ সেন্টিমিটার অন্তর প্রতি গর্তে দু-তিনটি করে বসাতে হয়। প্রথম ফুল ফোটে বৈশাখে এবং আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ফল পাকতে থাকে। আয়ুর্বেদীয় ওষুধে ব্যবহার ছাড়াও রান্না ও মিষ্টির উপকরণ ও পানের মশলা হিসাবে এর ব্যাপক চাহিদা আছে।

ছোটো এলাচি ঃ দেখতে বড়ো এলাচের মতোই, কেবল পুষ্পস্তবক মরু এবং বিভক্ত। বড়ো এলাচ থেকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং কান্ত পত্রগুচ্ছে আবৃত। ফুল গোলাপি রঙের ডোরাকাটা, ফল অপেক্ষাকৃত ছোটো। কৃত্রিম তাপে শুকালে ঈষৎ বাদামি রং হয়। এটাই ছোটো এলাচ। চাষ এবং ব্যবহার বড়ো এলাচের মতোই। তৃতীয় বছর থেকে পুরো ফসল পাওয়া যায় সপ্তম বছরের শেষে নতুন আবাদ প্রয়োজন।

লেখক ঃ শৈবাল কুমার গুহ, ফোন ঃ ২৫৫৬৩৯১০

পুকুর ঘিরে সমস্যা

5 পাতার পর

ঢাল বজায় রেখে খুঁটি পুঁতে পাড় বাঁধালে ইকোসিস্টেমে উল্লেখিত প্রতিটি উপাদান নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে। কংক্রিটের বাঁধে ভবিষ্যতে যে প্রকৃতিতে অঘটন ঘটবে ফলশ্রুতি হিসেবে পুরোটা ইকোলজিক্যাল বুমেরাং (Ecological Boomerag) হয়ে যাবে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে এতে যে লোকসান হবে তাতে সমস্ত টাকাটাই পুকুরের জলে যাবে।

তুষারকান্তি গলুই, ৯৬৩৫৯৩১৩৬২

কার্বন নিয়ে কারসাজি

প্রকৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌল হলো কার্বন। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ কার্বনের বিভিন্ন যৌগ দিয়ে তৈরি। কার্বন শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Carbo' থেকে যার অর্থ 'Coal'। বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার প্রথম প্রমাণ করেন, কার্বন একটি মৌল। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে নিজের মূল রাসায়নিক ধর্ম না বদলে দুই বা তার বেশি ভিন্নরূপে অবস্থান করতে পারে। এই ধর্মকে বলে বহুরূপতা (Allotropy) মৌলিক পদার্থটির বিভিন্ন রূপকে বলি এর রূপভেদ (Allotrope)। কার্বন ছাড়া সালফার, ফসফরাস, অক্সিজেন ইত্যাদি কয়েকটি মৌলের বহুরূপতা দেখা যায়। কার্বনের কেলাসাকার রূপভেদ হিরের আণবিক গঠন চতুস্তলকের মতো। এখানে একটি কার্বন পরমাণু আরো চারটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। গ্রাফাইটের মধ্যে কার্বন পরমাণুগুলো সসুষম ষড়ভুজের আকারে সজ্জিত থাকে। কার্বনের আরেকটি কেলাসাকার রূপভেদ বাকমিনস্টার ফুলারিন (C_{60})। একে দেখতে ফুটবলের মতো। এর মধ্যে ১২টি পঞ্চভুজাকৃতি এবং ২০টি ষড়ভুজাকৃতি কার্বন বলয় আছে।

কার্বনের এক নতুন রূপ গ্রাফিন' (Graphene) আবিষ্কারের সুবাদে ২০১০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন আন্দ্রে গেইম (Andre Geim : birth 1 October, 1968) এবং কনস্টান্টিন নভোসেলভ (Konstrartin Novdslov : birth 23 August, 1974)। দুই পদার্থবিদই বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। দুজনেরই জন্ম রাশিয়ায়। আন্দ্রে বর্তমানে নেদারল্যান্ডস এর নাগরিক। নভোসেলভ-এর রুশ এবং ব্রিটিশ এই দুই দেশেরই নাগরিকত্ব রয়েছে।

কি এই গ্রাফিন? পেন্সিলের সিসে থাকে গ্রাফাইট। গ্রাফাইট হলো কার্বনের বহুরূপের একরূপ। পেনসিল দিয়ে লিখলে কালো কার্বনের হাল্কা আস্তরন কাগজে আটকা পড়ে কিন্তু কার্বন বা গ্রাফাইটের এই আস্তরণ যথেষ্ট পুরু। যদি আরও পাতলা আস্তরণ তৈরি করা যেত, তাহলে কেমন হতো সেটা। আস্তরণটা যেখানে যেখানে এক-পরমাণু পুরু সেই জায়গাগুলিকে আলাদা করতে হবে। দুই বিজ্ঞানী আন্দ্রে গেইম ও কনস্টান্টিন নভোসেলভ এই চেষ্টাটাই করলেন। ২০০৪ সালে তাঁরা ব্যতিচারের আলোকীয় ক্রিয়া পদ্ধতির সাহায্যে গ্রাফাইট আস্তরণের এক-পরমাণু পুরু অংশগুলিকে চিহ্নিত করলেন। সেলোটেপের মতো অ্যাডেসিভের সাহায্যে গ্রাফাইট থেকে কার্বনের পাতলা স্তর ওঠানোর চেষ্টা করে এক সময় এমন একটা পাতলা স্তর আলাদা করলেন, যার বেধ কার্বনের একটা পরমাণুর সমান। এই পাতলা কার্বনের স্তরকে থ্রি ডায়মেনশনাল না বলে টু ডায়মেনশনাল বলাই ভালো। পাতলা হলেও এই স্তর কিন্তু যথেষ্ট শক্তপোক্ত, তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী। দুই বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলাফল 'সায়েন্স' জার্নালের ২২ অক্টোবর, ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যায়। বিজ্ঞানী মহলে কার্বনের এই নতুন রূপের নাম হয়ে যায় গ্রাফিন।

গ্রাফিন কার্বনের একটি কেলাসাকার রূপভেদ। কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি এক-পরমাণুপুরু (One-atom thick) সমতল চাদরের মত। ষড়ভুজের ছয় কোনায় ছয়টি কার্বন পরমাণু—এমনি নকশায় গ্রাফিনের কেলাস জাফরি (Crystal lattice) ঠিক যেন মৌচাকের প্রকোষ্ঠগুলি গায়ে গায়ে। গ্রাফিনে কার্বন-কার্বন বন্ধনী দৈর্ঘ্য ০.১৪২ ন্যানোমিটার। গ্রাফিনের চাদরগুলি পরপর বসে গ্রাফাইট তৈরি করে। ওপর-নিচ দুটি গ্রাফিন চাদরের দূরত্ব ০.৩৩৫ ন্যানোমিটার। ৩ মিলিয়ন গ্রাফিন চাদর পরপর বসে মাত্রা ১ মিলিমিটার পুরু গ্রাফাইট আস্তরণ তৈরি করবে। এই গ্রাফিন-ই গ্রাফাইট, চারকোল, কার্বন ন্যানোটিউব এবং ফুলারিনের মূল গঠনমূলক একক। কত পাতলা এই গ্রাফিন? সাবানের ফেনা যতটা পাতলা তার ১০০০০ ভাগের এক ভাগ। ১ ইস্পাতের ১০০ গুন দৃঢ়। গ্রাফিনে টান প্রয়োগ করে এ মূল দৈর্ঘ্যের ২৫% প্রসারিত করা যায়।

সাধারণ গ্রাফাইটের তুলনায় গ্রাফিন অভিনব। একদিকে যেমন এটি হাল্কা, স্বচ্ছ তেমনই প্রচন্ড মজবুত। এর আণবিক বিন্যাস এমনই ঠাসবুনোট যে হিলিয়াম অনুও একে ভেদ করতে পারে না। এই গবেষণার সুফল অনেক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাফিনের ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

তড়িতের সুপরিবাহীতার জন্য বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত সিলিকন ট্রানজিস্টারের বদলে ব্যবহৃত হবে গ্রাফিন ট্রানজিস্টার। বিজ্ঞানীরা গ্রাফিনকে কাজে লাগিয়ে ব্যালিস্টিক ট্রানজিস্টর তৈরির কথা ভাবছেন। এতে কম্পিউটারে ডেটা প্রসেসিং এবং আদান প্রদানের কাজে সময় লাগবে অনেক কম।

গ্রাফিন দ্বিমাত্রিক হওয়ায় একে উৎকৃষ্ঠ মানের সেন্সর (Sensor) হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। কোনো গ্যাসের একটি অনুকে চিহ্নিত করণের কাজে গ্রাফিন ব্যবহার করা যাবে। গ্রাফিন তলে শোষিত গ্যাস অনুর স্থানে তড়িৎ রোধের পরিবর্তন পরিমাপ করে এই কাজ সম্ভব। সাধারন ভাবে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য তামা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু হাল্কা অথচ মজবুত গ্রাফিন ব্যবহার করতে পারলে খরচ

এরপর ৪ পাতায়

কার্বন কারসাজি

7 পাতার পর

অনেক কমবে।

গ্রাফিনের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অত্যন্ত বেশি। গ্রাফিন অত্যন্ত স্বচ্ছ। গ্রাফিন স্বচ্ছ, সুপরিবাহী তড়িৎদ্বার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। টাচ স্ক্রিন, লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, অর্গানিক ফটোভোল্টেইক সেল এবং অর্গানিক লাইট এমিটিং ডায়োড তৈরিতে গ্রাফিন ব্যবহৃত হবে। তড়িতের কুপরিবাহী প্লাস্টিকের সঙ্গে এক শতাংশ গ্রাফিন মিশিয়ে প্লাস্টিককে তড়িতের সুপরিবাহী করে তোলা যাবে।

সৌরকোষ তৈরিতে গ্রাফিন ব্যবহার করা যাবে। নগন্য ভরের গ্রাফিনের ক্ষেত্রফল অত্যন্ত বেশি। এই গ্রাফিনকে কাজে লাগিয়ে আলট্রাক্যাপাসিটর তৈরি করা সম্ভব যার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ আধান সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব।

চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস এর বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গ্রাফিন অক্সাইড চাদর *Escherichia coli*-এর মতো ব্যাক্টেরিয়াদের ধ্বংস করতে সক্ষম।

গ্রাফিনকে এমনি আরো অনেক কাজে ব্যবহার করার কথা ভাবছেন বিজ্ঞানীরা।

লেখক ঃ গোবিন্দ দাস, *E-mail : gcd_ast@rediffmail.com*
Ph.: 9332431102

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিজ্ঞান দরবার আয়োজিত কাঁচরাপাড়া অ্যালবাট্রস স্কুলে 'বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরমাণু চুল্লির বিপদ' শীর্ষক সেমিনারের বক্তব্য রাখছেন কোপেনহেগেন বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান কর্মী কল্লোল রায়। সেমিনারে অধ্যাপক চন্দন সুরভি দাস বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করেন। সেমিনারে বিজ্ঞান দরবারের সভাপতি ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ২৬টি অঙ্গীকারগুলি আলোচনা করেন। — নিজস্ব প্রতিনিধি

স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে সাপ নিয়ে সচেতনতা

কোচবিহার : ১৩ মে ঃ কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের উদ্যোগে পূর্বগুড়িয়াহাটি গালর্স হাইস্কুলে ১২মে বৃহস্পতিবার সারাদিনব্যাপী সাপ নিয়ে সচেতনতা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্কুলের শিক্ষিকা মঞ্জু কুন্ডু কর্মশালার শুরুতে বলেন ছাত্রীদের মধ্যে সাপ সম্পর্কে মারাত্মক ভীতি রয়েছে ও পাশাপাশি সাপ নিয়ে অজস্র ভুল ধারণা ফলে সাপ মেরে ফেলার প্রবণতা বেশি।

বিষধর ও নির্বিষ সাপের (পোস্টার সহ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। বিষধর সাপে কামড়ালে ১ ইঞ্চি দূরত্বে ২টি দাঁতের দাগ থাকবে, রক্তকালচে হবে, যন্ত্রণা হবে, ফুলতে শুরু করবে, গোখরো বা কেউটে সাপে কামড়ালে চোখের পাতা খুলতে পারবে না, জিহ্বা ও গলার অসাড়তা শুরু হবে, কথা জড়িয়ে যাবে, লালা পড়তে থাকবে। চন্দ্রবোরা সাপে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হবে। থুথু, বমি, মল মূত্রে রক্ত দেখা যায়। রক্তক্ষরণ হবে।

নির্বিষ সাপে কামড়ালে অর্ধচন্দ্রাকারে অনেক দাঁতের দাগ থাকবে। টাটকা লাল রক্ত বের হবে, সামান্য পরেই রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। ক্ষতস্থান স্বাভাবিক থাকবে, ফুলবে না, সামান্য জ্বালা করবে, যন্ত্রণা হবে না। পশ্চিমবঙ্গে বিষধর সাপগুলি যথা (ফনাধর), শঙ্খচূড়, গোখরো ও কেউটে (ফনাহীন), শাঁখামুটি, কালাচ, চন্দ্রবোড়া। শাখামুটি নিরীহ কামড়ের কোন রেকর্ড নেই। শঙ্খচূড় গভীর জঙ্গলে থাকে। বিষধর সাপের কামড়ের একমাত্র চিকিৎসা হল অ্যান্টিভেনম্ সিরাম ইনজেকশন। দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, মনোবল জোগাতে হবে।

বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা ও কর্মশালাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অন্বেষক এর পক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শেখর ঘোষ ও জয়দেব দে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে জলদূষণ ও তার প্রতিকার শীর্ষক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। —সংবাদদাতা

রিপোর্ট

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ বাঁশবেড়িয়ার পরিবেশ বন্ধু সংস্থার উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী বাসস্ট্যান্ড, মগরা ও বাঁশবেড়িয়া শঙ্খনগর প্রভৃতি অঞ্চলে 'পরিবেশ বাঁচাও' স্লোগানে দীর্ঘ পদযাত্রা ও বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভার আয়োজন করেন। পথসভায় দেবব্রত সেন, উৎপল বিশ্বাস ও বাপ্পা মোদক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরিবেশ কর্মীরা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য প্লাস্টিক বর্জন ও নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মাছের সাহায্যে মশা নিয়ন্ত্রণ

মশার জ্বালায় আমরা প্রতিদিনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। মশা মারার কতই না চেষ্টা করি। কয়েল জ্বালাই। বিষ তেল জ্বালাই বা স্প্রে করি, জানলায় নেট লাগাই কিন্তু মশাদের বাগে আনতে পারছি কই?

মশা সে শুধু কামড়ে আমাদের বিরক্ত করে তাই নয়, আমাদের দেশে মশা বাহিত রোগের আক্রমণ প্রতি বছরই ঘটে। মশাবাহিত রোগ বলতে আমি বলছি ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া, এনকেফেলাইটিস এইসব রোগের কথা। আমাদের রাজ্যেও এইসব রোগ প্রতি বছরই আক্রমণ করে আমাদের অনেক সময় মারাও যান অনেক রোগী। আগে দেখা যেত স্ত্রী মশারা বদ্ধ নোংরা জলেই ডিম পারত কিন্তু এখন তারা নিজেদের চরিত্র বদলে ফেলেছে (জিনগত পরিবর্তনের ফলে)। তারা পরিষ্কার অল্প স্রোতযুক্ত জলেও বেশ স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ছে। তাই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিও ঘটেই চলেছে।

আমাদেরও তাই মশাদের নিয়ন্ত্রণ করার অন্য কিছু উপায় বার করতে হবে, সে উপায় হবে পরিবেশ-বান্ধব। কয়েল বা তেল জ্বালিয়ে বিষ স্প্রে করে মশা মারতে গিয়ে আমরা পরিবেশের ক্ষতি করি। একই সঙ্গে ক্ষতি হয় আমাদের স্বাস্থ্যেরও। অনেক দেশে এইসব বিষাক্ত জিনিস দিয়ে মশা মারা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এইসব বিষাক্ত জিনিস এখনও বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। আমরাও বাধ্য হয়ে সেগুলো কিনছি।

সহজ, পরিবেশ বান্ধব, স্বল্প খরচের উপায় কিন্তু আছে আমাদের হাতের কাছেই। দরকার একটু উদ্যোগ ও সদিচ্ছা, আর একটু প্রচারের এমন কতকগুলো মাছ আছে, যারা মশার লাভা খেতে খুব পছন্দ করে। এই মাছগুলোর কোনো কোনোটা আমরা আমরা অনেক সময়ে অ্যাকোয়ারিয়ামে রেখে থাকি। আবার কোনোটা হয়ত ততটা পরিচিত নয়। তবে এই মাছগুলো নর্দমার জলে ভালই বেঁচে থাকতে পারে। ঐসব জলই তো জল মশার জন্মস্থান। তাই ঐসব জলে যদি এই মাছগুলো উদ্যোগ নিয়ে ছাড়া যায়, তবে খুব সহজেই মশার লার্ভা ধ্বংস করা যায়। মাছগুলোর নাম এবার বলি এরা হল তেচোখো, দাঁড়কে, গাপ্পি, গাম্বুসিয়া, তেলাপিয়া, খলসে, চাঁদা, জেব্রা মাছ, গোল্ড ফিশ্ ইত্যাদি।

এই মাছগুলোর মধ্যে কয়েকটা আছে যারা বর্তমানে সংখ্যায় কমে গেছে (যেমন - দাঁড়কে, তেচোখো, খলসে, চাঁদা)। এদের সহজেই চাষ করা যায়। এরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, যারা মাছ চাষে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বা নিতে চান, তাঁদের দিয়ে এই মাছগুলো চাষ করানো যায়। দু'ভাবে এই মাছের বাজার পাবেন তারা। একদিকে রঙিন মাছ হিসাবে (শৌখিন মাছ হিসাবে) এরা বিক্রি হবে। অন্য দিকে পঞ্চায়েত বা পৌরসভায় যদি এই মাছ তাঁদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মশার আঁতুড় ঘরগুলো ছাড়ার ব্যবস্থা করে তাহলে তাঁরাও আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখবেন। আর আমরাও মশার হাত থেকে রক্ষা পাব। মশা মারার তেল ছড়াতে বা অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার যা খরচ হয়, তার থেকেই কম খরচে এই ব্যবস্থা করা যাবে। এতে পরিবেশ ও আমাদের স্বাস্থ্য দুই-ই রক্ষা পাবে। আর প্রায় দুষ্প্রাপ্য হতে বসা মাছের প্রজাতিগুলোও রক্ষা পাবে। মশা বাহিত রোগের হাত থেকেও রক্ষা পাব আমরা। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এ ব্যাপারে কাজ চলছে। আমরাও একবার চেষ্টা করে দেখি না!

ড. শতাব্দী দাস
এএ-২৯ প্রফুল্ল কানন (পশ্চিম), ফ্ল্যাট ২এফ, একুশ শতক -১, কলকাতা-৭০০১০১, মোঃ- ৯৮৩৬৫৭২৯২১

কোচবিহার রাজারহাট হাইস্কুলে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের উদ্যোগে বিজ্ঞানের মজা হাতে কলমে করে দেখানো হচ্ছে।

রিপোর্ট

বলাগড়ে চাই সৌরবিদ্যুৎ, চাই না তাপবিদ্যুৎ

হুগলী জেলার বলাগড়ের ভবানীপুর চড় (যা ৫ কিমি চওড়া), সবুজ দ্বীপ সহ আশপাশের গ্রামে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের বসবাস। গোটা অঞ্চলটি গঙ্গার নিম্ন অববাহিকায় হুগলী নদীর মধ্যে বহুদিন ধরে পলি জমে চড় তৈরী হয়েছে। এই অঞ্চলে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করতে উদ্যোগী।

সবুজকে ধ্বংস না করে, গঙ্গাকে দূষিত না করে, বিকল্প হিসেবে এই অঞ্চলে ৭৫০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট সৌরবিদুৎ কেন্দ্র তৈরী করা সম্ভব। 'বলাগড়ে চাই সৌরবিদ্যুৎ, চাই না তাপবিদ্যুৎ' দাবীতে স্থানীয় ১০টি বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংস্থার কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই প্রচার আন্দোলন চালাচ্ছেন। এছাড়া আঞ্চলিক স্তরে বিকল্প শক্তির উৎসগুলির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

অলৌকিক চিকিৎসার কয়েকটি বিবরণ

মন্ত্রতন্ত্র চিকিৎসা ঃ মানুষের অজ্ঞতার ফলেই রোগ চিকিৎসার জন্য তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ, কবচ, পাথর, জলপড়া, থালাপড়া শুরু হয়েছিল। মানুষ ভাবত মন্ত্রতন্ত্রে রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। চোখ ওঠা, বাত, জন্ডিস, বিভিন্ন ব্যথা, হাঁপানি, জলাতঙ্ক, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা মন্ত্রতন্ত্রে করা হতো। ওঝা মন্ত্র দিয়ে ঝেড়ে রোগীর বিষ নামিয়ে দেয়। বিষধর সাপে কামড়ালে অ্যান্টিভেনম্ সিরাম ইনজেকশন (এ.ভি.এস), জলাতঙ্ক রোগের ক্ষেত্রে আগাম টিকা (অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাক্সিন) নিতে হবে। থালাপড়া বা মন্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগীরা মৃত্যু অনিবার্য। মন্ত্রতন্ত্র আসলে এক ধরণের অপচিকিৎসা। হাড় ভেঙ্গে গেলে লতাপাতা (দুধকর্নি, *Equomia bonalex*) জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়, ১৫ দিন পরে লতাপাতা ভাঙ্গা অংশ থেকে খুলে দেওয়া হয়। এর ফলে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাড় স্বাভাবিক গঠনে আসে না। চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, পঙ্গুত্বের স্বীকার হয়।

রত্নে রোগ চিকিৎসা ঃ জ্যোতিষীরা দাবী করেন মানুষেরা নানা রকম রোগ হয় বিভিন্ন গ্রহের জন্য যেমন শকুনী গ্রহের প্রভাবে জলবসন্ত, পুতনা গ্রহের জন্য পাতলা পায়খানা, শীত পুতনার জন্য কলেরা, অন্ধপুতনার জন্য হাস, বাস্তবে এইসব গ্রহের কোন অস্তিত্বই নেই। গ্রহগুলি কোটি কোটি মাইল দূরে থাকায় মানুষের শরীরে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষের দেহে রোগ হয় শারীরবৃত্তীয় কার্যকারণের জন্য, কোন গ্রহের ফেরে নয়।

জ্যোতিষীরা বলেন মৃগীতে নীলা, অশ্বরোগে পলা, হৃদরোগ নীলা ইত্যাদি। একইভাবে চুনী, পান্না সূর্যকান্তমনি ও চন্দ্রকান্তমনি ধারণ করতে বলেন। রোগ চিকিৎসায় রত্নের রোন ভূমিকা নেই। রত্নগুলি আসলে সমুদ্রখনিজ বা রাসায়নিক খনিজ পদার্থ যেমন—

নীলা — অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড
পলা — ক্যালসিয়াম কার্বনেট
গোমেদ — গারনেট (ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অক্সিজেন)
পান্না — বেরিল (বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন)

জ্যোতিষীরা যেভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করেন যে গ্রহ রত্নে রোগ সারে তা বে-আইনী। ভারতীয় আইন The Drugs and magic remedies (obectionable advt.) Act 1954, অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। অথচ বড় বড় শহরে জ্যোতিষীরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং লোকজনদের প্রতারণা করেন। জ্যোতিষীদের সব রকমের প্রচার ও ব্যবসা বেআইনী ঘোষণা করা দরকার। জ্যোতিষীদের কাছ থেকে সবাইকে দূরে থাকতে হবে।

বানমারা ঃ নখ, চুল, রক্ত, থুথু বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মন্ত্র পড়ে কোন ব্যক্তিকে অসুস্থ বা মেরে ফেলার চেষ্টাকে বানমারা বলে। ওঝা, গুনিন, ডাইনী ও ভানুমতি ইত্যাদিরা বানমারা বলে ধারনা করা হয়। গাছকেও মেরে ফেলা যায়। গরুর বাটের দুধ শুকিয়ে যায়। বানমেরে চোখে সূচ ফুটিয়ে অন্ধ করে করে অপবাদ দিয়ে মেরে (ডাইনী) ফেলা হয়।

আসলে বানমেরে কোন লোককে অসুস্থ বা মেরে ফেলা যায় না। মৃগী, ফিট, যক্ষ্মা রিকেট ইত্যাদি হলে ধরে নেওয়া হয় যে বান মেরেছে। দরিদ্র মানুষ শিক্ষা ও অর্থের অভাবে ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না, ফলে তারা অলৌকিক চিকিৎসার খোঁজে ছুটে যায়। ওঝা, গুনিনরা রোগ সারাতে না পারলে নানা রকম অপবাদ দিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকতে চায়।

গাছের গোড়ায় তুঁতে (কপার সালফেট, $CuSo4, 5H_2o$) বা বেশি লবন (সোডিয়াম ক্লোরাইড Nacl) দিলে বা দীর্ঘদিন গরম জল ঢাললে গাছ মারা যাবে। গরুর বাটে রক্ত পড়ে গরুর বিশেষ রোগ (স্তন প্রদাহ বা Mastitis) হয়। এটি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

জনডিসে হাত ধোয়া ঃ জনডিস সারানোর অপকৌশল, রোগীর হাত ধুঁয়ে হলুদ জল বার করে। কৌশলটি হল একটি পাত্রে চুন জল রাখা হয়। ওঝা আগেই নিজের হাতে আমগাছের ছালের রস মেখে রাখে। এরপর রোগীর হাত চুন জলের মধ্যে রেখে হাত ধুয়ে হলুদ রং বের করে। চুন জল এব ং আমগাছের ছালের রস বিক্রিয়ায় জল হলুদ হয়।

ন্যাবারমালা ঃ বামন হাটির শিকড় দিয়ে একটি মালা গলায় ঝুলিয়ে দিলে আপনা-আপনি বড় হয়ে শরীর দিয়ে নেবে যায়। (বামন হাটির শিকড় ফাঁপা; এর উপর ফাঁস গিট দেওয়া হয়) শিকড় শুকিয়ে ছোট হয়, মালা বাড়তে থাকে।

জনডিস অর্থাৎ রক্তে বিলিরুবিন ($C_{38}H_{36}N_4O_6$) এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জনডিস হয়। প্রতি ১০০ ঘন সেমিতে ০.১১ মিগ্রা (স্বাভাবিক) এর বেশী হলে দেহের বিভিন্ন অংশ হলুদ হতে থাকে। ২ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে, চর্বি, তেল, ঘি খেতে নেই। সেদ্ধ সব্জি, চিনির জল খেতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে। ওঝা বা গুনিলদের কাছে গেলে বিপদ বাড়বে।

দাঁতে পোকা ঃ দাঁতে কালো গর্তকেই দাঁতে পোকা লেগেছে বলা হয়। বিশেষ করে শর্করা (ভাত, রুটি) জাতীয় খাদ্য খাওয়ার পর টুকরো দাঁতে লেগে থাকে যেখানে ল্যাকটিক, পাইরুভিক বুটারিক ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরী হয়, ফলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস সহ এনামেলকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে দিতে হবে। এরপর শুরু হয় যন্ত্রণা। কিছু অসাধু লোক এগুলিকেই দাঁতে বলে ঠকায়। ট্রেনে বা বাসে দাঁত পরিষ্কার

এরপর 11 পাতায়

অলৌকিক চিকিৎসার

10 পাতার পর

করার জন্য লাল ওষুধ বিক্রি করা হয়। এতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড় (Hcl) এবং লাল রং মেশানো হয়। এগুলি ব্যবহার করলে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি হয়। গুড়াকু বা কয়লার ছাই দিয়ে দাঁত মাজা অনুচিৎ, বরং নিম গাছের কচি ডাল দিয়ে দাঁত মাজা মাড়ির পক্ষে উপকারী। দাঁতে পোকা আসলে দাঁতের রোগের সারানোর অপকৌশল।

নাড়ীবন্ধ ঃ হৃৎপিন্ড মিনিটে ৬০-৭০ বার সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। কব্জির ঠিক উপরে, বাইরের দিকে রেডিয়াস হাড়ের উপরে ও চামড়ার নীচে রেডিয়াল ধমনি নাড়ী (Pulse) দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। বগলের নীচে এক্সিলারী ধমনি নীচে নেমে যায়। কনুইয়ের সামনে রেডিয়াল ও আলনা ধমনিতে বিভক্ত হয়। বগলের ভিতরে কাপড়ের প্লাস্টিকের কৌটো রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে ব্রেকিয়াল ধমনি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে রেডিয়াল ধমনিতে আর নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যাবে না। এভাবেই তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এ ধরণের অভ্যাস বারণ করা উচিত।

গ্রহণে খাদ্য গ্রহণ ঃ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের খাবার খাওয়া উচিত নয়। প্রচলিত বিশ্বাস যে রাহু বা কেতু নামে দুটি গ্রহ সূর্যকে খেয়ে ফেলে, এ সময়ে দৈত্যের কোপ বা জীবানুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রাহু বা কেতু গ্রাস বা খেয়ে ফেলার ফলে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। রাহু বা কেতু নামে কোন গ্রহ মহাকাশে নেই। জ্যোতিষীদের মনগড়া অবাস্তব ধারণা। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরল রেখায় এলেই গ্রহণ হয়। জীবানুর সংখ্যার কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। গ্রহণের সময় খালি চোখে সর্যের দিকে তাকাতে নেই। সূর্যগ্রহণ চশমা বা এক্সরে প্লেট বা ফটো ফিল্ম (এক্স পোসড়) ডাবল করে দেখতে হবে। গ্রহণের সময় খাবার খেলে কোন অসুখ বিসুখ হবার সম্ভাবনাই নেই।

বিনা আগুনে যজ্ঞ ঃ ওঝা-গুনিন-বাবাজিরা মন্ত্রের সাহায্যে ঘি ঢেলে বিনা আগুনে যজ্ঞ করেন, যা আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়া। শুকনো জায়গায় কাঠের গুড়ো বা কাগজের টুকরোর মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) রেখে দেওয়া হয়। পরে ঘি এর বোতল থেকে পিওর (১০০ ভাগ শুদ্ধ) গ্লিসারিন (CH_2O-$CHOH$-CH_2OH) ঐ শুকনো কাঠের গুড়ো বা কাগজের মধ্যে ধীরে ধীরে ফেলা হয়। তাপ উৎপন্ন হবে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুন জ্বলে উঠবে। মনে হবে যে অলৌকিক ভাবেই আগুন জ্বলে উঠল, আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আগুন জ্বলে উঠল!

ঠিকুজি, গোত্র ও কোষ্ঠী বিচার করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন হয়ে আসছে। অথচ রক্তের গ্রুপ জানা সবচেয়ে জরুরী—

নিরাপদ বিবাহ	পুরুষ রক্তের গ্রুপ	নারী রক্তে গ্রুপ
	A	A, AB
	B	B, AB
	O	O,A,B,AB
	AB	AB
	Rh(+)	Rh(+)
	Ph(-)	Rh(+), Ph(-)

বিপজ্জনক বিবাহ	পুরুষ রক্তের গ্রুপ	নারী রক্তের গ্রুপ
	A	O,B
	B	O,A
	AB	O,A
	AB	O,A,B
	Ph(+)	Ph(-)

রক্তের মোট ৪টি গ্রুপ যথা A, B, AB এবং O

AB কে সর্ব্বজনীন গ্রহীতা গ্রুপ,

O কে সর্ব্বজনীন দাতা গ্রুপ বলা হয়।

রেসার্স ফ্যাক্টর (Rh)-এর অসঙ্গতি সবচেয়ে মারাত্মক। Rh হল বংশগত ও জিনগত বৈশিষ্ট্য। Rh(-) এর অ্যান্টিবডি খুব দুর্বল, Rh(+) এর অ্যান্টিবডি খুব সবল। নারীর রক্তে Rh(-) হলে, পুরুষ রক্তে Rh(+) হলে ভ্রূন গঠনে খুব অসুবিধা হয়। নবজাতক শিশুটি খুবই দূর্বল হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হিমোলাইটিক বা জনডিসে মারা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

রোগ চিকিৎসার নামে অলৌকিক প্রচার তথা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা বা অপকৌশলগুলি মানুষকে দুর্বিসহ করে তোলে, পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষ অলৌকিক চিকিৎসার দ্বারা প্রতারণার শিকার হন।

তাই সর্বস্তরে (জেলা থেকে ব্লক, ব্লক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত) জনমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যেখানে রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগ চিকিৎসার জন্য বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি মানুষের জন্য বিশুদ্ধ জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ (জীবনদায়ী) চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে সুবন্দোবস্ত করা উচিত। কেন্দ্র বা রাজ্য পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ এর পরিমাণ মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ করা উচিত।

প্রতিটি হাসপাতালে (প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (Essential drugs) সাপে কামড়ানোর AVS ইনজেকশন, কুকুরে কামড়ানোর জলাতঙ্ক রোগের টিকা (ARV) সহ পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট ও অন্যান্য সহযোগী (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) লোকজন সব সময়ের জন্য থাকা দরকার।

লেখক ঃ জয়দেব দে, মোঃ- ৯৪৭৪৩৩০০৯২

রিপোর্ট

১) হিরোশিমা দিবস ঃ আগামী ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবসে ৩২টি সংগঠনের যৌথ প্রকাশনায় 'পরমাণু বিদ্যুতের বিকল্প চাই' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হতে চলেছে। স্থান ঃ র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে। কফি হাউসের তিনতলা, ১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩, সময় ঃ বিকাল ৩টে। বইটি লেখক ঃ সুরেশ কুন্ডু।

২) নাগাসাকি দিবস ঃ আগামী ৯ আগস্ট মঙ্গলবার বিকেল ৫টা-৭টা নাগাসাকি দিবসে বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে ২নং প্লাটফর্ম অন্নপূর্ণা বুক স্টলের সামনে 'পরমাণু চুল্লির বিপদ' শীর্ষক এক প্রচার সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যাত্রী পায়রা

Passenger Pigeon (Ectopistes migratorius)

না, আমরা কোনদিন দেখিনি। আর দেখতেও পাব না। মার্থা নামক যাত্রী পায়রার শেষ বংশধরটি মৃত্যু হয়েছে আমেরিকার সিনসিনাটি চিড়িখানায়, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দল হিসাবে চিহ্নিত ছিল এমনকি রকি পর্বতমালার পঙ্গপালের দলের থেকেও বড়। ১৮৬৬ সালের একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে উত্তর আমেরিকার ওন্টারিওতে একটি যাত্রী পায়রার দল দেখা গিয়েছিল যা ১ মাইল চওড়া, ৩০০ মাইল লম্বা ছিল। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করতে তাদের ১৪ ঘন্টা সময় লেগেছিল। অনুমিত যে এই দলে প্রায় ৩.৫ কোঁটি পাখি ছিল।

যাত্রী পায়রার পুরুষরা ৪২ সেন্টিমিটার, স্ত্রী ৩৮ সেন্টিমিটার এবং লেজটি প্রায় ২০-২৩ সেন্টিমিটার লম্বা হত। ওজন ৩৪০ থেকে ৪০০ গ্রাম। গ্রীষ্মকালীন প্রজননের সময় এরা পূর্ব আমেরিকার রকি পবর্ত অঞ্চলে অবস্থান করত। শীতকালে মধ্য কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো ও কিউবায় ছড়িয়ে পড়ত। কয়েক'শ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এদের বাসা দেখা যেত। এক একটি গাছে ১০০'র বেশি বাসা থাকত।

এই সামাজিকতা ও দলবদ্ধতা তাদের শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষ করত। কিন্তু এই রক্ষা কবচ মানুষ নামক শিকারীর কাছে ছিল সুবর্ণ সুযোগ। ১৯০০ সালের মধ্যে তারা পৃথিবী থেকে মুছে গেল। উইসকনমিনে একটি প্রজনন ক্ষেত্রে ৮৫০ বর্গমাইল জুড়ে প্রায় ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ বাসা ছিল, একটি মাত্রা ডিম থেকে ১২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে বাচ্চা হত। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বাচ্চার লালন পালন করত। এরা প্রধানত বিভিন্ন বীজ, কেঁচো ও পোকামাকড় খেতো।

আমেরিকায় উপনিবেশ তৈরি হওয়ার শুরুর দিকে যাত্রী পায়রার নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। এতো সহজলভ্য হওয়ায় শুয়োরের খাবার থেকে জমির সার হিসেবেও এদের ব্যবহার হতে থাকে। ক্রীতদাসদের জন্য সবচেয়ে সস্তা খাবারের যোগান ছিল পায়রার মাংস।

১৮৫০ সাল থেকে যাত্রী পায়রার সংখ্যাল্পতা চোখে পড়তে থাকে, কিন্তু হত্যা চলতেই থাকে। ১৮৭৮ সালে একটি প্রজনন ক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০,০০০ পাখি মারা হত। একটি মাত্র ডিম থেকে হওয়া বাচ্চাকে বড় করার আগেই পূর্ণ বয়স্করা শিকারে পরিণত হত। ফলত ১৮৯৬ সালে ২,৫০,০০০ পাখির দলটির হত্যার সাথে সাথেই দলগত ভাবে যাত্রী পায়রার অস্তিত্ব লোপ পেল। শিকার ছাড়াও বনভূমি কমে যাওয়াও এদের লোপ পাওয়ার পরোক্ষ কারণ এবং এটিও প্রত্যক্ষভাবে মানুষেরই কুকীর্তি।

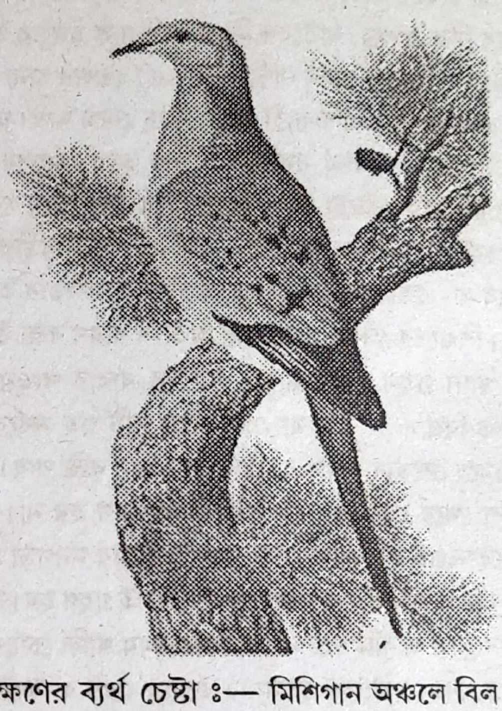

সংরক্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা ঃ— মিশিগান অঞ্চলে বিল পাশ করে প্রজনন ক্ষেত্রের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়। তবে এই আইন পালতি হয়নি। ১৮৯৭ সালে ১০ বছরের জন্য যাত্রী পায়রা হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সে সময় যে ছোট ছোট দলগুলি বেঁচেছিল তাদের পক্ষে সফল প্রজনন করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বন্দী অবস্থায় প্রজননের চেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

শেষ যাত্রী পায়রা মার্থা ওয়াশিংটন এর দেহ মিথসোনিয়ান ইনিস্টিটিউটে হিমায়িত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে যা জনসাধারণের সন্মুখে আনা হয় না। মার্থার প্রতিমূর্তি আজও সিনসিনাটি চিড়িয়াখানায় মানুষের নৃশংসতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

কল্যাণ কুমার রায়, ৯৪৩৩৫৭০৭০৪

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)   E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in